

নাট্যশাস্ত্রের তারিখ ও রচয়িতা সম্পর্কিত বিতর্ক

“নাট্যশাস্ত্র” প্রাচীন ভারতের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তবে এর রচয়িতা ও রচনাকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বোঝা যায়, এই গ্রন্থটি কোনো একক ব্যক্তির রচনা নয়—বরং বহু শতাব্দী ধরে সংকলিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, নাট্যশাস্ত্র মূলত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে গঠিত হয়েছিল। আবার কিছু গবেষক বলেন, এর বিভিন্ন অধ্যায় ভিন্ন সময়ে সংযোজিত হয়েছে—ফলে এটি একটি “সমষ্টিগত রচনা” (composite work)।

নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনির ব্যাকরণে ও পাণিনির মহাভাষ্য-এর ভাষ্যকার পতঞ্জলির রচনায়। এই উল্লেখগুলো থেকে অনুমান করা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ “নাট্যশাস্ত্র” নামে কোনো শিল্পবিষয়ক শাস্ত্র প্রচলিত ছিল।

গ্রন্থটির রচয়িতা হিসেবে প্রচলিত নাম ভরত মুনি। তবে “ভরত” শব্দটি এখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নাও হতে পারে। অনেক পণ্ডিতের মতে, “ভরত” শব্দটি আসলে একটি প্রতীকী নাম—যার অর্থ “অভিনয়কারী” বা “শিল্পীসমাজের প্রতিনিধি”। অর্থাৎ “ভরত” হতে পারেন কোনো এক ব্যক্তি, আবার হতে পারেন একাধিক নাট্যাচার্যের সমষ্টি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, নাট্যশাস্ত্র ৩৬ বা ৩৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল (কিছু সংস্করণে অধ্যায়সংখ্যা ৩৬, কিছুতে ৩৭)। এতে নাট্যকলা, অভিনয়, নৃত্য, সংগীত, রসতত্ত্ব, মঞ্চসজ্জা, পোশাক ও নাট্যনীতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ভরত মুনি গ্রন্থটির সূচনায় বলেন, দেবতাদের অনুরোধে তিনি ব্রহ্মার কাছ থেকে “নাট্যবেদ” প্রাপ্ত হন—যা চারটি বেদের সারসংক্ষেপ। এই পৌরাণিক কাহিনির অন্তরালে একটি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে: সমাজে এমন একটি নতুন শিল্পধারা গড়ে উঠছিল যা ধর্মীয় আচার ও জনমানসের বিনোদন — উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এই সময়ে নাট্যশিল্প ছিল একদিকে ধর্মীয় অনুশীলনের সম্প্রসারণ, অন্যদিকে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যম। নাট্যশাস্ত্রের ভাষায়, নাট্যকলার উদ্দেশ্য ছিল—

“ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের শিক্ষা প্রদান ও আনন্দদান।”

অতএব, নাট্যশাস্ত্রকে কেবল অভিনয়বিষয়ক পাঠ্য বলা যায় না; এটি ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও বিনোদনের সংমিশ্রিত সাংস্কৃতিক দলিল।

নাট্যকলার ধর্মীয় তাৎপর্য ও আধ্যাত্মিক দিক

ভরত মুনি নাট্যকলাকে কেবল একটি পারফর্মিং আর্ট বা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি; তিনি একে একপ্রকার ধ্যানমার্গ ও ধর্মীয় সাধনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

“নাট্যং ভেদস্য প্রতিনিধি।”

অর্থাৎ, নাট্য হলো চার বেদের সারমর্ম, যা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ — এই চার পুরুষার্থের শিক্ষার প্রতীক।

দেবতাদের দ্বারা নাট্যের উৎপত্তি

নাট্যশাস্ত্রের সূচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনি বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ, হিংসা ও অন্যায় দেখে ব্রহ্মা দেবতাদের অনুরোধে নতুন একটি বেদ রচনা করেন, যা সবার জন্য উন্মুক্ত—

“শূদ্ররাও যাহাতে অংশ নিতে পারে, এমন এক বেদ”—

এটাই ছিল নাট্যবেদ।

এই কাহিনি ইঙ্গিত দেয় যে নাট্যকলার জন্ম ধর্মীয় আচার থেকে হলেও এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ঐক্য ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠা করা। এটি একাধারে দেবতাদের বিনোদন ও মানবসমাজের নৈতিক শিক্ষার উপায়।

নাট্যকলায় যজ্ঞের প্রতীক

ভরত মুনি নাট্যপ্রদর্শনকে একধরনের “যজ্ঞ” বা পবিত্র উৎসর্গ হিসেবে দেখেছেন।

- মঞ্চ ছিল যজ্ঞবেদী,
- অভিনেতারা ছিলেন ঋত্বিক বা যাজক,
- নাটকের বিষয়বস্তু ছিল যজ্ঞের উপাচার,
- আর দর্শক ছিলেন যজ্ঞের অংশগ্রহণকারী।

অর্থাৎ, নাট্যকলার প্রতিটি অংশ ধর্মীয় আচার বা তত্ত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এইভাবে নাট্যশাস্ত্র নাট্যকলাকে শুধু সামাজিক বা নন্দনতাত্ত্বিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

রসানুভূতি ও মোক্ষের সম্পর্ক

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী, যখন দর্শক “রসানুভূতি” অনুভব করে—অর্থাৎ কোনো আবেগকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে কিন্তু তার দ্বারা আবদ্ধ হয় না—তখন সে একপ্রকার অহং-মুক্ত

অবস্থায় পৌঁছায়। এই অবস্থাই “আনন্দ” বা “ব্রহ্মানন্দ”-এর প্রতীক। তাই নাট্যকলার মাধ্যমে রসানুভূতি আসলে একধরনের আধ্যাত্মিক মুক্তি। যেভাবে যোগ বা ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ নিজের ভেতরের সত্যকে উপলব্ধি করে, নাট্যকলাও তেমনি মানুষের অন্তর্মনের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়। এ কারণেই নাট্যশাস্ত্র বলে—

“নাট্যং ধর্মস্য মূলম্।”

অর্থাৎ, নাট্য হলো ধর্মের মূল ভিত্তি।

শিল্পীর আধ্যাত্মিক ভূমিকা

অভিনেতা বা শিল্পী এখানে কেবল রসসৃষ্টিকারী নয়, তিনি এক প্রকার ধ্যানী সত্তা— যিনি নিজের শরীর ও কণ্ঠকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এক উচ্চতর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অভিনেতা যখন চরিত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত “আমি”-কে ছেড়ে বৃহত্তর মানবিক চেতনার সঙ্গে একাত্ম হন। এই অবস্থাই ভরত মুনির কাছে আধ্যাত্মিক সাধনার সমান। তাই নাট্যশাস্ত্রের মতে—

“যে অভিনেতা পূর্ণ নিষ্ঠায় অভিনয় করে, সে দেবতার পূজার সমান পুণ্য লাভ করে।”

অর্থাৎ, অভিনয় একধরনের পূজা, যেখানে রসই দেবতা, আর দর্শকের আনন্দই প্রার্থনার ফল।

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের বৈশিষ্ট্য

নাট্যশাস্ত্র কেবল নাট্যবিষয়ক গ্রন্থই নয়, বরং সংগীত, নৃত্য, অলঙ্কার ও স্থাপত্যকলারও প্রাচীনতম ও সর্বাধিক প্রামাণ্য নির্দেশিকা। নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথমেই মুনিদের অনুরোধে ভরত মুনি প্রেক্ষাগৃহ বা নাট্যমণ্ডপ নির্মাণের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করেন। ভরতের মতে, নাট্যের সূচনা নাট্যমণ্ডপ থেকেই হয়, এবং তা ইচ্ছেমতো নির্মাণ করা যায় না। দেবতাদের জন্য যেহেতু মানসিক জগতই যথেষ্ট, তাই তারা ইচ্ছামতো স্থান কল্পনা করতে পারেন; কিন্তু মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই নির্মাণের পূর্বে সমস্ত মাপজোক ও উপকরণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। ভরত বলেন—

“দেবতাদের সৃষ্টিগৃহ মানসিক, কিন্তু মানুষের জন্য তা যত্নসহকারে নির্মাণ করতে হয়।”

প্রেক্ষাগৃহের প্রকারভেদ

নাট্যশাস্ত্রে প্রেক্ষাগৃহকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে—

1□ আকার বা রূপ অনুযায়ী,

2□ পরিমাপ বা আয়তন অনুযায়ী।

আকারের বিচারে প্রেক্ষাগৃহ তিন প্রকার—

- বিকৃষ্ট (সর্বকৃতি/বৃত্তাকার, মতান্তরে বর্গাকার)
- চতুরঙ্গ (চতুষ্কোণ/ আয়তাকার),
- ত্র্যঙ্গ (ত্রিভুজাকৃতি)।

মাপের বিচারে তা—

- জ্যেষ্ঠ (বৃহৎ),
- মধ্যম,
- কনিষ্ঠ (ক্ষুদ্র)।

এই দুই ধরনের মিলনে মোট নয় প্রকার নাট্যমণ্ডপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদের মতে—

- জ্যেষ্ঠ = সর্বকৃতি,
- মধ্যম = চতুরঙ্গ,
- কনিষ্ঠ = ত্র্যঙ্গ।

নাট্যমণ্ডপের পরিমাপ দু'ভাবে নির্ধারিত হত—

হস্তমাত্রা ও দণ্ডমাত্রা অনুসারে।

ভরতের মতে মোট ১৮ প্রকার মণ্ডপের কথা বলা হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহের মাপ

নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

- জ্যেষ্ঠ মণ্ডপ: ১০৮ হাত,
- মধ্যম মণ্ডপ: ৬৪ হাত,
- কনিষ্ঠ মণ্ডপ: ৩২ হাত।

এর মধ্যে

- জ্যেষ্ঠ মণ্ডপ দেবতাদের উপযোগী,
- মধ্যম রাজাদের জন্য,
- কনিষ্ঠ সাধারণ প্রজাদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত।

ভরত বলেছেন—

“সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে মধ্যম প্রকার সর্বোত্তম, কারণ সেখানে সংলাপ ও সংগীত সহজে শ্রুত হয়।”

প্রাচীন ভারতীয় পরিমাপপদ্ধতি

প্রাচীন ভারতীয় পরিমাপব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক। ভরত মুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* নাট্যমণ্ডপ নির্মাণের জন্য সুনির্দিষ্ট মাপের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে নির্মাণে সামান্যতম ত্রুটি না ঘটে। তাঁর প্রদত্ত এককগুলি ছিল নিম্নরূপ—

একক সমান

৮ অণু = ১ রজ

৮ রজ = ১ কেশ (চুল)

৮ কেশ = ১ লিক্ষা (উকুন)

৮ লিক্ষা = ১ ইউকা (ছোট পোকা)

৮ ইউকা = ১ যব (যবদানা)

৮ যব = ১ আঙুলি

২৪ আঙুলি = ১ হস্ত

৪ হস্ত = ১ দণ্ড

অর্থাৎ ৮ যব = ১ আঙুলির সমান, যা *অর্থশাস্ত্র* ও *নাট্যশাস্ত্র* উভয় গ্রন্থেই উল্লিখিত হয়েছে।

ভূমি পরীক্ষা (ভূমি-পরীক্ষা)

নির্মাণ শুরুর আগে ভূমি পরীক্ষা করা অপরিহার্য। নাট্যমণ্ডপ নির্মাণের পূর্বে ভূমি পরিষ্কার করে, হাল চাষের মাধ্যমে নরম করা উচিত, যাতে ভেতরে থাকা হাড়, কাঠ, পেরেক বা অনুপযুক্ত বস্তু থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

ভরত মুনি বলেছেন—

“নাট্যমণ্ডপ এমন স্থানে নির্মিত হোক যা সমতল, শক্ত মাটি বিশিষ্ট এবং কালো বা সাদা বর্ণের মাটি হয়।”

ভিত্তি বা নীভ (নির্মাণের সূচনা)

নাট্যশাস্ত্র অনুসারে, নাট্যমণ্ডপের নীভ ‘মূল নক্ষত্রে’ (এক শুভ লগ্নে) স্থাপন করা উচিত। নীভ স্থাপনের সময় শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ভেরি, পণব ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

মঞ্চমূলে (সভাসদ) ও স্তম্ভনির্মাণ

নির্মাণকাজ শুরু করে প্রথমে ‘সভাসদ’ বা মূল মঞ্চ নির্মাণ করতে হয়। এটি যেসব উপকরণে তৈরি হতো তা নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও, ভরত নির্দেশ দিয়েছেন যে দর্শকরা যে চৌকো আসনে বসতেন তা ইট বা মাটির গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত হওয়া উচিত।

ভরত উল্লেখ করেছেন—

“স্তম্ভ স্থাপনের আগে মঞ্চের মাপ ঠিক করে নেওয়া আবশ্যিক।”

সভাসদের উচ্চতা ন্যূনতম ১৮ ফুটের কম হওয়া উচিত নয় বলে ধারণা করা হয়। এরপর স্তম্ভ স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

“ভিত্তি স্থাপনের পরই স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।”

স্তম্ভ স্থাপন সূর্যোদয়ের সময় করা হয়। সাধারণত ২৪টি স্তম্ভ ব্যবহৃত হতো—

- ৪টি চার কোণে,
- ১০টি প্রেক্ষাগৃহের জন্য,
- ৪টি রঙ্গপীঠের জন্য,
- ৬টি রঙ্গশীর্ষের জন্য।

স্তম্ভের প্রতীকী অর্থ

ভরত মুনি এই স্তম্ভগুলিকে সমাজের চার শ্রেণির প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন—

- ব্রাহ্মণ,
- ক্ষত্রিয়,
- বৈশ্য,
- শূদ্র।

স্তম্ভ স্থাপনকালে মন্তপাঠ ও আচারানুষ্ঠান করা উচিত, কারণ এটি ছিল পবিত্র এক স্থাপত্যকর্ম। এছাড়াও ভরত সতর্ক করে বলেছেন, নাট্যমঞ্চের স্তম্ভ যেন দর্শকদের দৃষ্টিকে আড়াল না করে। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন—

“নাট্যমণ্ডপ পাহাড়ের গুহার মতো আকারে নির্মিত হওয়া উচিত, এবং স্তম্ভগুলো সভাসদের সারির সোজাসুজি স্থাপন করা উচিত।”

রঙ্গপীঠ ও মন্তবারণী

নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে মন্তবারণী (উঠানো বারান্দা বা ব্যালকনি) মূলত রঙ্গপীঠের উপরে নির্মিত হতো।

ভরত মুনি বলেন—

“রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে মন্তবারণী নির্মাণ করতে হবে।”

এটি ছিল বারান্দার মতো উঁচু স্থান, যা রঙ্গপীঠ বা রঙ্গশীর্ষের দুই পাশে তৈরি করা হতো। মন্তবারণী রঙ্গপীঠের চেয়ে উচ্চতর ছিল। যদিও এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট নয়, ধারণা করা হয় এটি শব্দপ্রবাহ বা আলোক প্রতিফলনের জন্য সহায়ক ছিল। আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে মন্তবারণীর স্থান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে।

নাট্যমণ্ডপের সিঁড়ি ও কাঠামো

নাট্যমণ্ডপে ইট দিয়ে তৈরি সিঁড়ি থাকত, যার ওপর কাঠের আসন বা মঞ্চবস্তু স্থাপন করা হতো। প্রতিটি সিঁড়ির উচ্চতা এক হাতের মতো হতো, এবং সাধারণত আট ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি তৈরি করা হতো। এ ধরনের সিঁড়ির উদাহরণ সিতাভেঙ্গা গুহা-র সামনে দেখা যায়, যেখানে কাঠের পিড়ি বা বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছিল।

ধারণা করা যায়, রঙ্গপীঠের মাটি দর্শকসারির মাটির চেয়ে কিছুটা উঁচু ছিল, যাতে মঞ্চের দৃশ্য প্রতিটি দর্শকের কাছে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়।

ভরত মুনি বলেন—

“নাট্যমণ্ডপ পাহাড়ের গুহার মতো আকৃতির হওয়া উচিত।”

অনেক ব্যাখ্যাকার ‘গুহাকৃতি’ শব্দটির অর্থ দুইতলা প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন — যেমনটি আধুনিক থিয়েটারগুলিতে দেখা যায়।

রঙ্গমণ্ডপের বিন্যাস

রঙ্গমণ্ডপ বা মঞ্চকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে —

1□ রঙ্গপীঠ (মঞ্চভাগ),

2□ রঙ্গশীর্ষ (মঞ্চের উপরের অংশ বা ব্যাকড্রপ),

3□ নেপথ্য (পর্দার পিছনের অংশ)।

রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের পারস্পরিক অবস্থান নিয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এক বিষয়ে সবাই একমত—

নেপথ্য, যা মঞ্চের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তার মুখ রঙ্গপীঠের দিকে থাকা উচিত।

রঙ্গপীঠের পেছনের দিকে নেপথ্য নির্মাণ করতে হয়, যেখানে অভিনেতারা নিজেদের সাজসজ্জা করতেন।

নেপথ্য বা পর্দার পিছনের অংশ

নেপথ্য মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

‘রেবা প্রসাদ ত্রিবেদী’-র *নাট্যশাসনম্* গ্রন্থে বলা হয়েছে—

“মঞ্চের পেছনের স্থান দুই ভাগে বিভক্ত; একদিকে পুরুষ অভিনেতারা পোশাক ও অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হতেন, অন্যদিকে অভিনেত্রীরা নিজেদের সাজসজ্জা করতেন।”

এই স্থান থেকেই ‘আকাশবাণী’ বা অফস্টেজ সংলাপ উচ্চারিত হতো।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গদেবতা-র পূজারও নির্দেশ দিয়েছেন। ধারণা করা হয় এই রঙ্গদেবতার মূর্তি বা প্রতীক রঙ্গশীর্ষের দিকে মুখ করে স্থাপন করা হতো, আর তাঁদের পেছনের দিকেই থাকত রঙ্গপীঠ।

ভূমি ও মঞ্চ প্রস্তুতি

রঙ্গপীঠ, নেপথ্য, মত্তভারণী এবং রঙ্গশীর্ষের সঠিক স্থাপনের পর বেদিকা (মঞ্চের পাদান) প্রস্তুত করা হতো। এর জন্য কালো মাটি ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পাথর, কাঁকর ইত্যাদি না থাকে। জমিকে হাল চাষের মাধ্যমে সমান করতে হবে। ভূমি এমনভাবে সমতল করতে হবে যেন তা মাছ বা কচ্ছপের পিঠের মতো সামান্য বাঁকা ও মসৃণ হয়।

দরজা ও প্রবেশপথ

প্রেক্ষাগৃহে দুটি প্রধান দরজা থাকত—

- একটি দক্ষিণ দিকের,
- অন্যটি পূর্ব দিকের।

আপস্তম্ব সূত্র অনুসারে, পূর্বদিকের দরজা পার্থিব সুখ ও মঙ্গলের প্রতীক, আর দক্ষিণদিকের দরজা স্বর্গীয় সুখের প্রতীক। তাই প্রাচীন রীতি অনুযায়ী পূর্বদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ এবং

দক্ষিণদিকের দরজা দিয়ে প্রস্থান করার নিয়ম ছিল। আজও ভারতের বহু ঘরে এই রীতি প্রচলিত—বাড়ির মূল দরজা পূর্বমুখী রাখা হয়, যাতে শুভ শক্তির প্রবেশ ঘটে।

নাট্যমণ্ডপেও নেপথ্য থেকে রঙ্গপীঠে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা রাখা হতো—

- একটিতে অভিনেতার মঞ্চে প্রবেশ করতেন,
- অপরটি ব্যবহৃত হতো নাট্যোপকরণ বা উপাদান আনার জন্য।

ভরত বলেছেন—

“মঞ্চের আরম্ভস্থলে একটি দরজা এবং দ্বিতীয় দরজা অন্য প্রান্তে থাকা উচিত।”

বায়ুপ্রবাহ ও আলো

নাট্যশাস্ত্রে ‘বিসনক’ (যার অর্থ জানালা বা বায়ুপ্রবেশ পথ) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, নেপথ্যের দরজায় বা মঞ্চের উপরের দিকে এই বায়ুপ্রবেশ পথ রাখা হতো, যাতে বাতাস চলাচল ও শব্দপ্রবাহ সহজ হয়। মঞ্চের সামনেই পর্দা বা পটিকা ব্যবহারের কথাও উল্লেখ আছে।

প্রেক্ষাগৃহের অলঙ্করণ ও সজ্জা

নাট্যমণ্ডপের দেয়ালে প্রলেপ বা রঙের কাজ শেষ হলে সেগুলিতে নানা ধরনের চিত্র অঙ্কিত করা হতো।

এই চিত্রগুলির মধ্যে সাধারণত দেখা যেত—

- নারী ও পুরুষের শৃঙ্গার ও অলঙ্কার সংক্রান্ত ললিত চিত্র,
- বৃক্ষ, লতা, ফুল, পর্বত, নদী ইত্যাদির মনোরম দৃশ্যচিত্র।

ভরত মুনি নির্দেশ দিয়েছেন যে মঞ্চের মুখ যেন পাহাড়ের গুহার মতো আকারে নির্মিত হয়।

এর জন্য কাঠের ব্যবহার সাধারণ ছিল।

এই কাঠের গঠনেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত—যা প্রাচীন স্থাপত্যের এক বৈজ্ঞানিক কৌশল।

নাট্যমণ্ডপের নির্মাণে কাঠ ছিল এক প্রধান উপাদান।

ভরত উল্লেখ করেছেন—

তোরণ (প্রবেশতোরণ),

লতা (আলংকারিক বক্ররেখা),

গর্বাঙ্ক (ছাদে বায়ুপ্রবেশের জানালা),

অট্টালিকা (উচ্চ ভবন বা শোভা মঞ্চ),

শালভঞ্জিকা (দেয়ালে বা স্তম্ভে খোদাই করা নারীমূর্তি) ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশ।

সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের স্থান

রঙ্গশীর্ষ অংশেই সংগীতজ্ঞদের বসার স্থান নির্ধারিত ছিল। ভরত নাট্যশাস্ত্রের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা ও তাদের নাট্যপ্রয়োগ ব্যাখ্যা করেছেন। বাদ্যযন্ত্র, গীত ও নৃত্য এই তিনটির সমন্বয়েই ভারতীয় নাট্যকলার পূর্ণরূপ গঠিত হয়।

উপসংহার (নিষ্কর্ষ)

নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত নাট্যমণ্ডপ বা প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কিত তথ্য কেবল স্থাপত্যবিষয়ক নয়— এগুলি প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতিফলন। এতে দেখা যায়, ভরত মুনির তত্ত্বসমূহ কতখানি সূক্ষ্মভাবে বাস্তবভিত্তিক ছিল। এই নির্দেশনাগুলি একদিকে যেমন স্থাপত্যবিদ্যার (বাস্তুশাস্ত্রের) গভীরতা নির্দেশ করে, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পচিন্তার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তিও প্রকাশ করে।

নাট্যশাস্ত্রের মঞ্চনির্মাণবিধি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতীয়রা শুধু শিল্পরসিকই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানমনস্ক স্থপতি ও সংগঠক। তাদের রচিত প্রেক্ষাগৃহগুলি ছিল শুধু নাট্যাভিনয়ের স্থান নয়, বরং সমাজ, ধর্ম ও নান্দনিকতার এক জীবন্ত প্রতীক।

ভরত মুনির এই নির্দেশনাগুলি আজও আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এটি প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতের নাট্যচিন্তা কেবল ধর্মীয় বা আবেগনির্ভর ছিল না, বরং তা ছিল পরিমাপ, অনুপাত, আকুস্টিক্স ও নন্দনতত্ত্বভিত্তিক এক পরিপূর্ণ বিজ্ঞান।